রাজনীতিতে নারীর ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব কত দূর?

চিররঞ্জন সরকার

যে কোনো দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে সে দেশের জনসংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এ অর্ধেক জনসংখ্যা যদি পশ্চাৎপদ থাকে, তাহলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তা ছাড়া আধুনিক ব্যক্তিমানুষের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা খুবই স্বাভাবিক। রাজনীতিই জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। ফলে মানুষ হিসেবে নারী রাজনীতিবিচ্ছিন্ন কোনো জীব নয়। রাজনীতির মূল বিষয় হলো ক্ষমতা। ক্ষমতা এবং ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হলো রাজনীতি। ক্ষমতা অর্জন এবং তা ধরে রাখার সংগ্রাম, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রয়োগ বা তার প্রতিরোধমূলক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে রাজনীতি আবর্তিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা সমাজ ও রাষ্ট্রের সব সম্পদের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রধান চাবিকাঠি। ফলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ মানে হচ্ছে ক্ষমতাকাঠামোর সেই জায়গায় আরোহণ, যেখানে জনগণের জন্য সম্পদের মালিকানা বণ্টন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা অর্জিত হয়। অথচ শ্রেণিবৈষম্য এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে নারীরা আজও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নীতিনির্ধারণ থেকে অনেক দূরে। ফলে দৃশ্যমান রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব এখনো নগণ্য।

বর্তমান দুনিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের নানা প্রসঙ্গে কথা বলা হলেও এটা এখন প্রায় স্বীকৃত যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া নারীর পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। জাতিসংঘ বলছে, রাজনীতিতে কিংবা সরকারে অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোতে বা আইনসভায় নারীর অংশগ্রহণ মানে আবশ্যিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের তালিকা বদলে দেওয়া, লৈঙ্গিক প্রেক্ষাপটে নতুন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার আলোকে মূলধারার রাজনীতিতে বহুমাত্রিকতা যুক্ত করতে পারা।

আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদেও নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। ২৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না'। ২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন'। ২৯(১) অনুচ্ছদে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে'। ২৯(২) এ আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।' জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ লক্ষ করলে দেখা যায়, এতে নারীদের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, শিক্ষাগত, পেশাগত, আইনগত ইত্যাদি বিভিন্ন অধিকার বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-এর অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হলো জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উদ্দেশ্যই হলো বিশ্বকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার পাশাপাশি সকল ধরনের অসমতা ও বৈষম্য থেকে মুক্ত করা। নিজের অধিকার নিয়ে মানুষ যাতে সুন্দরভাবে, নিরাপদে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে, সেজন্য ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে

এসডিজি অর্জনের মেয়াদ ধরা হয়েছে। বিশ্বের প্রায় সকল দেশ এই সময়ে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে কাজ করে যাবে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

এ ছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আরপিও)-এ একটি ধারা যুক্ত করা হয় ২০০৯-এর সংশোধনীতে। এই ধারায় বলা হয়েছে, ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সকল পর্যায়ের মূল কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সুতরাং আরপিও বাস্তবায়নের জন্যও দলগুলোর একটা বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ, আইন ও নীতিতে সমর্থন ও অঙ্গীকার সত্ত্বেও আমাদের দেশে নারীর ক্ষমতায়ন চিত্র মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ লক্ষ করা গেলেও বিশেষভাবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় অতি নগণ্য।

ক্ষমতায়ন ও নারী

নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে লিঙ্গ সমতার প্রতিচ্ছবি, যা একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা, অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। স্বাভাবিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যরূপে নারী-পুরুষ সব মানুষের মধ্যেই জন্মগতভাবে কিছু ক্ষমতা ও অধিকার বোধ থাকে। জীবন পরিচালনা বা জীবনমান অর্জনের ক্ষেত্রে যখন কোনো নারী বা পুরুষ তার সেই ক্ষমতা বা অধিকার ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্য সামর্থ্য ও স্বীকৃতি লাভ করে তখন তাকে ক্ষমতায়ন বলা যায়। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজ জীবন সে কীভাবে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করবে তা স্থির করার অধিকার ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টির সঙ্গে যুক্ত। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ব্যক্তির ভেতরে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা সে সমস্যা সমাধানের শিক্ষা ও শক্তি লাভ করে। সে পরনির্ভরশীল না হয়ে স্বনির্ভর হয়।

ক্ষমতায়নের ধারণাটি কিছুটা আপেক্ষিক। পরিবারের বাইরে এসে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হলেই নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি পূর্ণতা পায় না। আবার কর্ম বা পেশায় যোগ দিলে সেখানে তার অধিকার ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির মাত্রার ওপর নির্ভর করে তার ক্ষমতায়নের প্রকৃতি ও মাত্রা। নারী যখন কর্মজীবী হিসেবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় তখন সেক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে, বাস্তবায়নে, অভিগম্যতায়, নিয়ন্ত্রণে এবং সমতার ভিত্তিতে সুফল ভোগে নারীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না সেটা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। আবার রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, ভোট প্রদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দলে সমান স্থান অর্জন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার অধিকার কতটুকু নিশ্চিত হয়েছে তা দেখার বিষয়। এসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা না থাকলে বা নারী বৈষম্যের শিকার হলে তার ক্ষমতায়ন ব্যাহত বা ক্ষুণ্ন হয়। সেজন্যই সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে মৌলিকভাবে সম্পর্কিত।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

দেশ এগিয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু এখনো অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে আছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ২০১৮-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ১৪৯টি দেশের মধ্যে ৪৮তম স্থানে। যে বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে এই ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে এর মধ্যে একটি হলো, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে দেশ কতটুকু এগিয়েছে, তা দেখার জন্য তিনটি বিষয়ের

তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে; যেমন, সংসদে কতজন নারী সদস্য আছেন, মন্ত্রিপরিষদে কতজন নারী আছেন এবং গত ৫০ বছরের মধ্যে কত বছর রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে নারী দায়িত্ব পালন করেছেন। আর এই তিন ক্ষেত্রের অগ্রগতি বিবেচনায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে; সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। এই সাফল্যের পেছনে বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশে গত ৫০ বছরের মধ্যে প্রায় ২৮ বছরই সরকারপ্রধান হিসেবে নারী দায়িত্ব পালন করেছেন, যেটি বিশ্বে বিরল ঘটনা। কিন্তু দুটি ক্যাটিগরিতে কতজন নারী মন্ত্রিপরিষদে আছেন, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ভালো নয়। এখানে ১৪৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৬তম। সংসদে কতজন নারী আছেন এই ক্যাটিগরিতে আমাদের অবস্থান ৮০তম। তবে গড়ে বাংলাদেশের অবস্থান ভালো। বাংলাদেশের প্রধান দলগুলোর দলপ্রধানগণ নারী। তাঁরা অবসরে গেলে এই ধারা অব্যাহত থাকবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন পরিবার, সমাজ ও দেশ পরিচালনার সব ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে নির্ধারক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালনের অধিকার। নারী যখন কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়ে দলের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, দলের নীতি নির্ধারণ, গৃহীত নীতিসমূহ বাস্তবায়ন, দল ও প্রয়োজনে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রদান এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার লক্ষ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ গ্রহণ করার সাংবিধানিক অধিকার লাভ করে, তখন তার রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশ ও সরকার পরিচালনায় নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য নারীর মতামত গ্রহণের মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংসদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাই রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅংশীদারত্ব বাস্তবে না থাকলে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ এখনো সন্তোষজনক নয়। যদিও ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সরাসরি ভোটে লড়েছিলেন মাত্র দুজন নারী। তাও প্রধান দল থেকে নয়। তাঁরা জিততে পারেন নি। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ১৩ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন। সে সময় ক্ষমতাসীন দলের একজন নারীপ্রার্থীও ছিলেন না। ওই নির্বাচনে তিন নারীপ্রার্থী উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোট পেলেও জিততে পারেন নি। পরে মুসলিম লীগের খান-এ সবুরের একটি অতিরিক্ত আসন খুলনা ১৪ থেকে উপনির্বাচনে একই দল থেকে নির্বাচিত হন সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ। এ হিসেবে বাংলাদেশে তিনিই প্রথম নির্বাচিত নারী সদস্য।

নারীরা সরাসরি নির্বাচনে সফলতা লাভ করেন তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে। এ নির্বাচনে বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ হাসিনাসহ তিনজন নারীপ্রার্থী নির্বাচিত হন। শেখ হাসিনা নির্বাচিত হন তিনটি আসন থেকে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একজন নারী হিসেবে সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন খালেদা জিয়া। পরের ২৭ বছরের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আড়াই বছর বাদ দিয়ে বাকি সময় দেশের প্রধান নির্বাহী তথা প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার দায়িত্বে নারীরাই রয়েছেন।

কিন্তু এই শীর্ষপদগুলো ছাড়া নারীর অবস্থানে তেমন কোনো পরিবর্তন আসে নি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী নারীপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ৫৯ জন। এরপর আবার কমেছে। দশম সংসদ নির্বাচনে ছিলেন ২৯ জন।

এবারের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন ১১৮ জন নারী। শেষপর্যন্ত ৩০০ আসনের মোট এক হাজার ৮৪৮ প্রার্থীর মধ্যে ৬৭ আসনে ৬৭ জন নারী চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে বিজয়ী হন ২৩ জন। এই ২৩ জনের মধ্যে ২০ জন আওয়ামী লীগ থেকে, দুজন জাতীয় পার্টি এবং একজন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ থেকে নির্বাচিত হন।

অন্যদিকে বিগত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ২২ জন (২০১৪) নারী এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৮ জন জাতীয় পার্টির ৩ জন ও ওয়ার্কাস পার্টির একজন এমপি ছিলেন।

বলা হয়ে থাকে, সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সদস্যরা জনগণের মনোনীত প্রতিনিধি নন, দলের বা দলের নেতার আস্থাভাজন। তাঁদের কেউ কেউ কোনো প্রয়াত নেতার স্বজন। অনেকের কোনো জনসেবার অভিজ্ঞতা নেই। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আর সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্যকে জনগণ একই চোখে দেখে না। সরাসরি ভোটে যিনি নির্বাচিত তাঁর জনগণের কাছে কিছুটা হলেও জবাবদিহি থাকে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এখনো কম। তবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীপ্রার্থীদের সংখ্যা আগের নির্বাচনগুলোর তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। বর্তমান সংসদে নারীর সংখ্যা ৩৫০ জনের মধ্যে ৭৩ জন অর্থাৎ ২০.৮৫ শতাংশ।

দুটি প্রধান দলের শীর্ষ পদে নারী নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের রাজনৈতিক কাঠামো নারীর ক্ষমতায়নের সহায়ক নয়। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাও তাদের রাজনীতিতে আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও আমরা এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি নি, যাতে নারীরা নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসতে পারেন। এখনো দলীয় রাজনীতি অনেকটা পেশিনির্ভর।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সত্যিকারের প্রতিফলন ঘটে সংসদের সাধারণ আসনে নারীর প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে, যে ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে উপনীত হয় নি।

রাজনৈতিক দলে নারীর অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের চালকের আসনে নারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার জোরালো প্রতিফলন নেই। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বড় দলগুলোর সর্বশেষ কাউন্সিলে গঠিত কমিটিগুলো পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০২০ সালের মধ্যে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সর্বস্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার আইনি বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও সে লক্ষ্য পূরণে এখনো তেমন অগ্রগতি নেই।

২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলন থেকে কার্যনির্বাহী কমিটির ৮১ সদস্যের মধ্যে এ পর্যন্ত ৭৪ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে নারী হলেন সর্বমোট ১৯ জন (প্রথম আলো, ২২ ডিসেম্বর)। কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হলেন শেখ হাসিনা। সভাপতিমণ্ডলির ১৭ জন সদস্যের মধ্যে নারী হলেন তিনজন। তাঁরা হলেন– সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, বেগম মতিয়া চৌধুরী ও অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন। যুগ্মসাধারণ সম্পাদক পদে চারজনের মধ্যে একমাত্র নারী হলেন ডা. দীপু মনি। সম্পাদকমণ্ডলির ২৯ জনের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৫ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, এর মধ্যে নারী হলেন ৬ জন। তাঁরা হলেন– অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক বেগম ওয়াসিকা আয়শা খান, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. শাম্মী আহমেদ, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মেহের আফরোজ চুমকি, শিক্ষা ও মানবসম্পদ

বিষয়ক সম্পাদক শামসুন নাহার চাঁপা এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা। এ ছাড়া ৮ জন বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক পদের মধ্যে একজন নারীও ঠাঁই পান নি। নতুন কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ২৫ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে নারী হলেন ৮ জন। তাঁরা হলেন– আখতার জাহান, মেরিনা জামান কবিতা, পারভীন জামান, হুসনে আরা লুৎফা ডালিয়া, সফুরা খাতুন, সানজিদা খানম, মারুফা আক্তার পপি ও গ্লোরিয়া সরকার ঝর্ণা। তিনটি সদস্য পদে এখনো কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হয় নি।

৩৩ শতাংশের কোটা পূরণ করতে হলে ৮১ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীর সংখ্যা হতে হবে ২৬ দশমিক ৭৩, অর্থাৎ ২৭ জন। এখন ঘোষিত কমিটিতে আছে ১৯ জন। ৩৩ শতাংশ পূরণ করতে হলে আরো ৮ জন নারীকে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব দিতে হবে। যদিও পদ রয়েছে মাত্র সাতটি। এ ক্ষেত্রে সাতটি পদেই নারী প্রতিনিধি এলেও এবার কোনোভাবেই কোটা পূরণ হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের আগে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ছিল ৭৩ সদস্যের। এ কমিটিতে নারী ছিলেন ১০ জন, শতকরা হিসাবে ১৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ২০তম সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির আকার বেড়ে হয় ৮১ সদস্যের। এ কমিটিতে সভাপতিসহ ১৫ জন নারী ছিলেন, যা শতকরা হিসাবে ১৮ দশমিক ৫২ শতাংশ।

বিএনপির সর্বশেষ কাউন্সিলে গঠিত জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে ১২.৭৪ শতাংশ নারী। এ দলের ১৯ সদস্যের স্থায়ী কমিটিতে দলের চেয়ারপাসন খালেদা জিয়া ছাড়া অন্য কোনো নারী নেই। চেয়ারপারসনের ৭৩ সদস্যের উপদেষ্টা কাউন্সিলে নারী ৮.২১ শতাংশ। জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে নারী মাত্র ৯.৫৬ শতাংশ।

অন্য দলগুলোর মধ্যে জাতীয় পার্টি ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশ, সিপিবি ১৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ এবং জাসদ (ইনু) ১১ দশমিক ৯২ শতাংশ পড়ে নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পেরেছে। ছোট-বড় কোনো দলই এক-তৃতীয়াংশ নারী নেতৃত্ব গঠনের কাছাকাছিও যেতে পারে নি।

দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলে নারীদের দেখা গেলেও, ধর্মভিত্তিক দলগুলোতে তা নেই বললেই চলে। দেশে নিবন্ধিত ৪০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ইসলাম ধর্মভিত্তিক দল ১১টি। এদের মধ্যে এমন দলও আছে, যাদের কেন্দ্রীয় বা তৃণমূলের কোনো কমিটিতেই কোনো নারী সদস্য নেই।

ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন– স্থানীয় সরকারের এই পাঁচ স্তরে নারীর অংশগ্রহণ সংরক্ষিত থাকলেও যথাযথ ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। স্থানীয় সরকার বিভাগের তথ্যানুযায়ী, দেশের ১১টি সিটি করপোরেশনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদ ১৩২টি। ৩১৬ পৌরসভায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত পদ ৯৮২টি। ৬১টি জেলা পরিষদে সংরক্ষিত আছে ৩০৬টি পদ। এ ছাড়া ৪৯২ উপজেলা পরিষদে আছে ৪৯২টি নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদ। দেশের চার হাজার ৫৭১টি ইউনিয়নে ১৩ হাজার ৭১৩ সদস্য পদ সংরক্ষিত আছে নারীদের জন্য। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার চার স্তরে সারা দেশে নারীদের জন্য ১৬ হাজার ৫৯০টি পদ সংরক্ষিত থাকলেও তাঁদের দায়িত্ব এবং কাজের পরিধি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বলা নেই। ইউপি, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে পুরুষ প্রতিনিধিদের তুলনায় তিনগুণ ভোটে নির্বাচিত হলেও উন্নয়নকাজ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা উপেক্ষিত। উপজেলা ও জেলা পরিষদের চিত্রও প্রায় একইরকম।

স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত অনেক নারী প্রতিনিধির অভিযোগ, ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় জনগণকে। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো কাজই থাকে না তাঁদের। সিটি

করপোরেশনে প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন একজন নারী কাউন্সিলর। প্রতিটি ওয়ার্ডের মশক নিধন, জন্ম-মৃত্যু সনদ বিতরণসহ বেশ কিছু কাজ করে থাকেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর। কিন্তু নারী কাউন্সিলরদের ওই ধরনের কোনো কাজ নেই। তিনটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হলেও একটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত পুরুষ কাউন্সিলরদের সমান সম্মানী ও আর্থিক সুবিধা পান তাঁরা। এ ছাড়া, অফিস খরচ বাবদ পান মাত্র আড়াই হাজার টাকা। সিটি করপোরেশনের বেশ কয়েকটি স্থায়ী কমিটিতে নারী কাউন্সিলরদের সভাপতি বানানো হলেও কালেভদ্রে ওই সব কমিটির সভা হয়। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে নারীদের কর্মপরিধি সুনির্দিষ্ট করা দরকার।

এটা ধরেই নেওয়া হয় যে, নারীদের রাজনৈতিক দলের মূল কমিটিতে অংশ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁদের জন্য নারী সহযোগী সংগঠনই যথেষ্ট। তা ছাড়া, নারীরা নারী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। আবার অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবতা এমন দাঁড়িয়েছে, নারীদের জন্য শুধু নারী সংগঠন, আর মূল দলের সব পদ পুরুষের দখলে শুধু নারীবিষয়ক সম্পাদক পদটি বাদে। যে নারী ছাত্র তিনি স্বাভাবিকভাবে ছাত্র সংগঠনে যাবেন, যে নারী কৃষির সঙ্গে জড়িত, তার কৃষক সংগঠনে যাওয়াই স্বাভাবিক, যে নারী শ্রমিক তিনি শ্রমিক সংগঠনে যাবেন; কিন্তু কার্যত তাদের সবাইকে যেন নারী সংগঠনই করতে হবে। রাজনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাস্তবে নারীদের শুধু রাজনৈতিক সমাবেশে এবং ভোটের সময় নারী ভোটারের জন্য ক্যাম্পেইনে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। নারী সহযোগী সংগঠন এই কাজের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। কার্যত দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৃণমূলে নারীর কোনো অংশগ্রহণ নেই। দলের মধ্যকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াও গণতান্ত্রিক নয়। মিটিং-মিছিলে ঠেলাঠেলি করে বসার বা দাঁড়ানোর জায়গা দখল করতে হয়, দলগুলোর মিটিংও নারীবান্ধব নয়। দলে জেলা পর্যায়ে যেহেতু নারীবিষয়ক একটি সহযোগী সংগঠন রয়েছে, সুতরাং নারীদের দলের কার্যক্রমে নিয়ে আসা, স্থানীয় পর্যায়ে নমিনেশন প্রদান, অর্থ বরাদ্দ– সবই হয়ে থাকে নারী সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে। সুতরাং যেসব নারী মূল দলের সদস্য পদে থাকেন, তাঁদের দলে ভূমিকা পালনের সুযোগ সীমিত। আবার নারীবিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব কী, সেটিও পরিষ্কার নয়। কিন্তু বর্তমানে কমিটি করার ক্ষেত্রে যেহেতু আরপিও বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এক-দু'জনকে সম্পাদক পদে রেখে বাকিদের সদস্য হিসেবে রেখে দেওয়া হয়। এভাবে চলতে থাকলে যে উদ্দেশ্যে এই আইন করা হয়েছে, তা কখনোই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। নারীরা টপ ফাইভে না আসতে পারলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। তাতে কোনো উদ্দেশ্যই সফলতার মুখ দেখবে না।

উপসংহার

সব ধরনের ক্ষমতায় প্রতিনিধিত্ব করার পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণ এবং অনিবার্যভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। প্রয়োজন ক্ষমতাকাঠামোয় প্রতিনিধিত্ব লাভ করার মতো শক্তি বৃদ্ধি এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবেশ ও সামর্থ্য। তবে লক্ষ করা গেছে যে, পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা তাঁদের নিজস্ব ইচ্ছায় বা রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হন নি। পিতা, স্বামী, পুত্র কিংবা সমাজপতিদের ইচ্ছা-অনুমতি তাদের প্রার্থিতা, নির্বাচনী প্রচারণা ও জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারক হিসেবে কাজ করে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এনজিওর সচেতনতা কার্যক্রম ও উৎপাদন কাজে নারীদের সম্পৃক্তকরণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, বিশেষত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় নারীদের অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাতে বিদ্যমান পুরুষ শাসনের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব হয় নি।

চলতি বছরের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সকল স্তরে ৩৩ ভাগ নারী সদস্যের অংশগ্রহণের অঙ্গীকার পূরণ করতে হলে তৃণমূল পর্যায় থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে। তবে সংখ্যা পূরণই একমাত্র প্রতিকার নয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এমন উন্নত পর্যায়ে নিতে হবে, যেখানে পুরুষের

পাশাপাশি নারীরা সমভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রচর্চা বাড়াতে পারলে তৃণমূল থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

চিররঞ্জন সরকার অ্যাডভোকেসি এনালিস্ট, অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেইঞ্জ কর্মসূচি, ব্র্যাক। chiroranjan@gmail.com

তথ্যসূত্র

বিডিনিউজটুয়েন্টিফোরডটকম, নারী প্রতিনিধিত্ব : এক বছরের মধ্যে ৩৩% পূরণ হবে কী, ৮ ডিসেম্বর ২০১৯

আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে যাঁরা, প্রথম আলো, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯

Socio-political empowerment of women in Bangladesh, Meghna Guhathakurta, The Daily Sun, 6, August, 2019

Women leadership in Bangladesh politics still negligible, Ahammad Foyez, Newage, March 08, 2019

Women in politics: 2019, UN women

মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও আবুল কাসেম হায়দার, ২০০৮, বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নীতিমালা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা

রাশিদা আখতার খানম, ২০১১, নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের সাফল্য চিত্র (জানুয়ারি ২০০৯ পকপল জুন ২০১৭ পর্যন্ত), নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা